বিচিত্র-জীবন গ্রন্থমালা

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

॥ এক ॥

মেদিনীপুর জেলা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এর স্বাধীনতা-সংগ্রামের উজ্জ্বল ইতিহাস চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মেদিনীপুর সুদীর্ঘকাল স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে শেষ পর্যন্ত বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করে। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী তাম্রলিপ্ত বন্দর বাণিজ্য-গৌরবে প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুদিন একটি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে ছিল। বিগত স্বদেশী আন্দোলনে মেদিনীপুর যে অংশ গ্রহণ করেছিল, বঙ্গদেশে তারও তুলনা নাই।

এই মেদিনীপুরে বিখ্যাত শাসমল পরিবারের বাসস্থান। এঁরা প্রতিপত্তিশালী জমিদার বলে বিখ্যাত। মেদিনীপুর জেলার বহুস্থানে ও সুন্দরবন অঞ্চলে এঁদের বিস্তৃত জমিদারী ও জমিজমা আছে। এই জমিদারবংশ দেশের বহু জনহিতকর কার্যে অকাতরে অর্থদান করে আসছেন।

বীরেন্দ্রনাথের পিতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল, মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী। এঁদের বাস কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটি গ্রামে। এই গ্রামে ১২৮৮ সালের ৯ই কার্তিক, শনিবার বীরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময়ে তদীয় জ্যেষ্ঠতাত রামধন

বলেছিলেন ঃ "এই শিশু একদিন কৃতী মহাপুরুষ হয়ে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।" তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথ সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত তোতলা ছিলেন বলে কিছু বিলম্বে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি শৈশব থেকেই অত্যন্ত দুর্দান্ত ও একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি কাকেও ভয় করে চলতেন না, যা করবেন বলে সঙ্কল্প করতেন, তা থেকে তাঁকে কেউই প্রতিনিবৃত্ত করতে পারত না। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ছিলেন সকলের সর্দার। সহপাঠীদের কারও পক্ষে তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না।

এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষা হয়। পরে তিনি কাঁথি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় হতেই বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত হন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আদর্শ। কি করে তিনি সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বাগ্মী হবেন, কি করে তাঁর ন্যায় তিনিও দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন, এই ছিল তাঁর চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে অধিকাংশ পরিমাণে সফল হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি ইংরাজী ও ইতিহাস-অধ্যয়নেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন।

ক্লাসের পড়াশুনায় বীরেন্দ্রনাথের তেমন মনোযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তক ক্রয় করে অধ্যয়ন করতেন। ইংরেজী ও বাংলা রচনাতেও

তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা কবিতাও রচনা করতে পারতেন।

ধনীর পুত্র বলে বীরেন্দ্রনাথের মনে কোনও প্রকার অহঙ্কার ছিল না। ধনী ও নির্ধন—সর্বশ্রেণীর সহপাঠীদের সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশতেন এবং তাদের সুখদুঃখ সমভাবে প্রাণের দরদ দিয়ে অনুভব করতেন। সকলেরই তিনি দরদী বন্ধু ছিলেন। কারও বিপদ দেখলে তিনি শরীর ও অর্থ দিয়ে তার সাহায্য করতেন। বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্রদিগকে তিনি অর্থদানে এবং পুস্তক ক্রয় করে দিতে কখনও কাতর হতেন না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বনভোজন করতেন; সমুদয় ব্যয় বহন করতেন বীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

॥ দুই ॥

কাঁথি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বীরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ১৬ বৎসর মাত্র। কাঁথি হাইস্কুল হতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন এবং মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন।

বীরেন্দ্রনাথ আগাগোড়াই অস্পৃশ্যতাকে পছন্দ করতেন না; বরং এই প্রথাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণাই করতেন। বীরেন্দ্রনাথ যে মেসে বাস করতেন, সেখানে উন্নত ও অনুন্নত—

উভয় শ্রেণীর ছাত্রই বাস করত। তারা সকলেই এক পংক্তিতে বসে আহার করত। একদিন উন্নত শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের অভিভাবক সেই মেসে আগমন করেন এবং সকল ছাত্রেরই এক পংক্তিতে বসে আহারের ব্যবস্থা-দর্শনে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। তিনি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে মেস পরিত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। একথা শুনে তেজস্বী বীরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে, উন্নত শ্রেণীর ছাত্রগণ মেস পরিত্যাগ করে গেলেও তিনি অনুন্নত ছাত্রগণের সঙ্গে ঐ মেসেই বাস করবেন এবং তাদের সঙ্গে একত্রে আহার করবেন। তাঁর এই তেজস্বিতা দর্শনে আর কেউ মেস পরিত্যাগ করে যেতে সাহসী হয় নি।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই বীরেন্দ্রনাথ দেশের কাজে ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বীরেন্দ্রনাথ তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হন। এই সম্মেলনে তিনি মেদিনীপুর জেলা হতে অন্যতম প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হন।

এই বছরেই কলকাতায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার (কংগ্রেস) অধিবেশন হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনেরও অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর বীরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজে ভর্তি হন। তখন সুরেন্দ্রনাথ ঐ কলেজের ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসবার জন্যই তিনি ঐ কলেজে ভর্তি হন।

যখন তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখনই তাঁর হৃদয়ে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বার বাসনা বলবতী হয়ে ওঠে। তিনি বিলাত-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাঁর মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির কাছ থেকে সম্মতি পেলেন না। এতে তাঁর মন বড়ই খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু তিনি—কিছুতেই সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না।

একদিন হঠাৎ তিনি আত্মীয়-স্বজনগণের অজ্ঞাতসারে দক্ষিণ ভারতের তুতিকোরিন বন্দরে চলে যান এবং বিলাত-যাত্রার অনুমতি দেওয়ার জন্য সেখান থেকে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে টেলিগ্রাম করেন। মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁকে বিলাত-যাত্রার অনুমতি দান করেন। বীরেন্দ্রনাথ তখন বাড়ি ফিরলেন। কিছুদিন পরে তিনি কখনও মদ্যপান করবেন না বা হিন্দুর অখাদ্য কিছু খাবেন না এবং পবিত্র ও নির্মল জীবন যাপন করবেন বলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এক প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করে বিলাত যাত্রা করেন।

॥ তিন ॥

বিলাতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ মিড্‌ল টেম্পলে ভর্তি হন এবং সেখানে ব্যারিস্টারি পড়তে থাকেন।

বিলাতে অধ্যয়নকালে তিনি কখনও স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। সেখানে তিনি একদিনের জন্যও সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যান নাই এবং অতি পবিত্রভাবে নির্মল জীবন যাপন

করেছেন। তিনি সর্বদা অধ্যয়ন ও কিসে ভারতের পরাধীনতা-মোচন হবে, এই চিন্তায় কালযাপন করতেন। একদিন তাঁর বাসার কয়েকজন যুবক ছলনা করে ভুলিয়ে তাঁকে সিনেমা-গৃহে নিয়ে গিয়েছিল। এতে বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিছুদিন সেই বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

বীরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিলাত থেকে আমেরিকা-ভ্রমণে যান। সেই ভ্রমণে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতালাভ হয়। আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে ফিরবার পর বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপের নানাদেশ ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

১৯০৪ সালে বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করতে আরম্ভ করেন।

॥ চার ॥

দুই বৎসর কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করবার পর বীরেন্দ্রনাথ সেখান থেকে মেদিনীপুর জেলা কোর্টে গিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাঁর বেশ পসার জমে ওঠে। এই সময় থেকেই তিনি সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে যোগদান করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জেলা বোর্ড ও সদর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্বাচিত হন।

এই সময় দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের সাড়া পড়ে যায়। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল 'বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী

দ্রব্যের প্রচার।' বীরেন্দ্রনাথ মনপ্রাণ দিয়ে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর কর্মতৎপরতায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে যে জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। তিনি এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির একজন সভ্য ছিলেন।

মেদিনীপুরের একজন সুদক্ষ ব্যারিস্টাররূপে বীরেন্দ্রনাথের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১২ সালে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে ব্যারিস্টারি পরিত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে এখানেও তাঁর বেশ পশার জমে উঠে।

১৯১৩ এবং ১৯২০ সালে মেদিনীপুরে ভয়ানক বন্যা হওয়ায় ঐ জেলার কতকাংশের অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হয়। এই বন্যায় বহু ঘরবাড়ি ভেসে যায়, বহু গৃহপালিত প্রাণীর জীবন নষ্ট হয় এবং জনসাধারণের দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকে না। দেশবাসীর কাতর আর্তনাদে ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশায় বীরেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি বন্যাপীড়িত জনগণের সেবায় অগ্রসর হলেন। দেশবাসীর কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে তিনি একটি সেবকদল গঠন করেন এবং স্বয়ং তাদের নিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়ে আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন। ধনীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ এই সময়ে স্বীয় আভিজাত্য ভুলে গ্রামে গ্রামে জলে কাদায়, কোথাও পদব্রজে, কোথাও বা নৌকাযোগে ভ্রমণ করে আর্তের দুঃখ-নিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

এই সময়ে গভর্নমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাকে তুইটি জেলায় বিভক্ত করবার সঙ্কল্প করেন। এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, খড়গপুরে নতুন জেলার সদর স্থাপিত হবে। এই সংবাদে মেদিনীপুরবাসীরা বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। জেলাকে দু-ভাগে বিভক্ত করলে জেলাবাসীদের বহু অসুবিধা ভোগ করতে হবে—একথা ভেবে মেদিনীপুরে প্রবল আন্দোলন এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জেলা-বিভাগ রদ করবার জন্য প্রতিথযশা নির্ভীক জননায়ক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মাইতির সভাপতিত্বে একটি কমিটী গঠিত হয় এবং সেই কমিটী গভর্নমেণ্টের কাছে প্রেরিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই কমিটীর একজন সভ্য ছিলেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁদের সঙ্কল্প অটল রাখলেন এবং খড়গপুরে নূতন জেলার সদর-স্থাপনের জন্য সেখানে বহু অট্টালিকা-নির্মাণ আরম্ভ করে দিলেন। দেশবাসী যখন বুঝল, গভর্নমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাকে দু-ভাগে বিভক্ত করবেনই, তখন তারা কাঁথিতে নূতন জেলার সদর-স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করল। বীরেন্দ্রনাথ এই জন্য সংবাদপত্রে একাদিক্রমে বহু প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এই সমুদয় প্রবন্ধ গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ সালে কাঁথি-পরিদর্শনে যান। এই সময় বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গভর্নরের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এই সময়েই ইউরোপে প্রথম মহাসমর বাধে এবং গভর্নমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করবার সঙ্কল্প থেকে বিরত হন। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরকে

প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন বলেই তিনি এই জেলার প্রত্যেক আপদ-বিপদে ঐকান্তিকভাবে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতেন। মেদিনীপুরবাসীরাও তাঁর এই স্বদেশপ্রীতির জন্য তাঁকে তাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্পণ করতে কুণ্ঠিত হত না।

॥ পাঁচ ॥

বীরেন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯১৯ সালে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তিনি মেদিনীপুরের প্রতিনিধিরূপে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনিই এর পরবর্তী অধিবেশন মেদিনীপুরে আহ্বান করেন। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২০ সালে মেদিনীপুরে এই অধিবেশন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১৯২০ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। পাঞ্জাবকেশরী লালা লজপত রায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বীরেন্দ্রনাথ এই সময়ে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের খাদ্য-সরবরাহ-বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এতে তিনি বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

এই অধিবেশনের সর্বপ্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ ব্রত অর্থাৎ কোনও রূপ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে সর্বপ্রকারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের

সহযোগিতা বর্জন করা। বঙ্গদেশের আইনব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। পরে অবশ্য নাগপুর-অধিবেশনে দেশবন্ধুর মত পরিবর্তিত হয় এবং তিনি অহিংস অসহযোগ-নীতিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। বীরেন্দ্রনাথ নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের পর কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর অত বড় অর্থাগমের পথ আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তিনি কারও পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য মনে করেন নাই; তাঁর বিবেকের নির্দেশ-মতই তিনি তা করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বহু টাকা-আয়ের আইন-ব্যবসায় ছেড়ে দিলেন। ব্যারিস্টার মিস্টার শাসমল দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল হলেন। বাংলার আইনব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

এর কিছুকাল পূর্ব থেকে বীরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের আয়োজন করছিলেন, কিন্তু ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়-পরিত্যাগের পরই তিনি প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে ঘোষণা করে তা বন্ধ করে দিলেন। ব্যারিস্টারি পরিত্যাগ করেই তিনি সর্বপ্রথম গাড়িখানি ও ঘোড়াটি বিক্রয় করে দেন এবং আবার ট্রামগাড়িতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। ১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেই বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের প্রচারকার্যের জন্য যান। এই সময় তিনি কাঁথি মহকুমায় প্রায় দুই মাসকাল পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেন। প্রত্যহ তাঁকে আট-দশ মাইল হাঁটতে হত। এই সময় দেশবাসীরা শাসমলের নামে এরূপ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে যে, কোনও সভায় বীরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হবেন—এ কথা জানতে পারলে বহু দূরদূরান্তর থেকে সহস্র সহস্র লোক ছুটে আসত। এই সময় তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে একমাত্র কাঁথি মহকুমা থেকেই ২৭ হাজার টাকা তুলে তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, তা তিনি হৃদয়ে স্থান না দিয়ে তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে টাকা তুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। দেশের জন্য তাঁর কর্ত্তব্যবোধ এতই প্রবল ছিল।

॥ ছয় ॥

১৯২১ সালে মেদিনীপুরে আর একটি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এর নাম ইউনিয়ন বোর্ড-আন্দোলন। এই সময় গভর্নমেণ্ট মেদিনীপুর জেলায় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন প্রচলন করেন। লোকে শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে, এই আইনের বলে গরীব দেশবাসীর চৌকিদারী ট্যাক্স দশগুণ বর্ধিত হতে পারে। বীরেন্দ্রনাথও এর বিষময় ফল বুঝতে পারলেন। সেজন্য

তিনি এই আইনের বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাতে বীরেন্দ্রনাথ এই আইনের বিরোধিতা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব-সম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে স্থির হয় যে, বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করা চলবে না।

এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথকেই একাকী মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্য দণ্ডায়মান হতে হয়। তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলেন যে, এই আইন বাংলার ঘোর অনিষ্ট সাধন করবে। তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড-স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে লাগলেন।

মেদিনীপুরবাসীরা সর্বান্তঃকরণে শাসমলকে সমর্থন করল। তারা ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করবে না বলে বদ্ধপরিকর হল এবং সহস্র সহস্র লোক সভায় সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, তারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেবে না। বাংলার স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগ জনমত অগ্রাহ্য করে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করে। এর ফলে মেদিনীপুরে আন্দোলন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।

রামনগর থানার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রামের কতিপয় প্রজা একযোগে বদ্ধপরিকর হল যে, তারা ইউনিয়ন বোর্ডের ধার্য কর কিছুতেই দেবে না। এতে উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি রেগে তাদের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করলেন। বিচারে সেই সাতজন আসামীর ১৫ দিন করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। এই সংবাদ বীরেন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন না। তিনি তখন অন্যস্থানে ছিলেন। যখন তিনি এই সংবাদ পেলেন, তখন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের খালাস পাওয়ার মাত্র ছয়দিন বাকী ছিল। এই সংবাদে তিনি অতিশয় মর্মাহত হলেন। তিনি সংবাদ পেলেন যে, এক মঙ্গলবারে সকাল ছয়টার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জেল থেকে খালাস পাবে। ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে মেদিনীপুরের এই প্রথম নির্যাতিত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐদিন বিকালে কাঁথিতে একটি শোভাযাত্রা এবং একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। কাঁথিতে লাঞ্ছিতের সম্মান এই প্রথম বলে বীরেন্দ্রনাথ তাতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় গ্রাম্য পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হয়ে পড়েছিল; সুতরাং পদব্রজে যাওয়া ছাড়া যাওয়ার অন্য কোনও উপায় ছিল না। বীরেন্দ্রনাথ রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যেই কর্দমাক্ত পথে পদব্রজে যাত্রা করলেন। কয়েকমাইল পথ অতিক্রম করার পর পথের মধ্যেই ফতেপুরের সেই লাঞ্ছিত সাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তারা ঐদিন রাত্রেই জেল থেকে খালাস পেয়ে বাড়ির দিকে আসছিল।

তাদের পরিচয় পেয়ে বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। এজন্য তিনি ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম জানাতে লাগলেন। তাদের সঙ্গে নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি শহরে পৌঁছলেন। সকাল ছয়টার সময় তাদের নিয়ে একটি ছোট শোভাযাত্রা বের করা হল এবং বিকালে প্রায় দশ হাজার লোকের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হল।

ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স-আদায়ের জন্য সরকার হতে কম জুলুম করা হয় নাই। বীরেন্দ্রনাথের কঠোর পরিশ্রম এবং বিরাট সংগঠন-শক্তিতে কাঁথির জনমত এরূপভাবে গঠিত হয়েছিল যে, তারা হাসিমুখে সরকারের সমস্ত জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করেছিল। অনেক স্থলেই লোকে ট্যাক্স না দেওয়ায় সরকার পক্ষের লোক এসে তাদের থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি জোর করে নিয়ে যেত। কিন্তু যখন ঐ সমুদয় দ্রব্য নিলামে তোলা হত, তখন একজনও ক্রেতা জুটত না। একশত টাকা মূল্যের সামগ্রী এক টাকাতেও কিনতে কেউ অগ্রসর হত না। বহু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার সত্ত্বেও কোন গরুর গাড়ির গাড়োয়ান কাঁথি থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত এই সব ক্রোকী মাল নিয়ে যেতে সম্মত হয় নি। সরকারের লোকেরা এইভাবে বিব্রত হয়ে অবশেষে যাদের মালপত্র জোর করে তারা নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলি আবার তাদের ঘরে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে লাগল।

এইভাবে গভর্নমেন্টের মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড-প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা এক দিনেই মেদিনীপুর থেকে ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিলেন। গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সমবেত চেষ্টা সফল হল। বীরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই এটি সাধিত হয়েছিল। যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন-প্রবর্তনের কোনও কল্পনাই করা হয় নাই, তখন মেদিনীপুর জেলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন জয়যুক্ত হল। বীরেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে এক প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিনে মেদিনীপুর থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে দেওয়া না হবে, ততদিন তিনি জুতা ব্যবহার করবেন না—নগ্নপদে থাকবেন। বীরেন্দ্রনাথ এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

॥ সাত ॥

মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড-প্রতিরোধ-আন্দোলন শেষ হলে বীরেন্দ্রনাথের কাছে অন্য কর্মক্ষেত্র থেকে ডাক এল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক হবার জন্য কলকাতায় আহ্বান করলেন। বীরেন্দ্রনাথ এই আহ্বানে কলকাতায় এসে কার্যভার গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হলেন সভাপতি।

এই কার্যে বীরেন্দ্রনাথকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। এই সময় দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যালয়-স্থাপনের সাড়া পড়ে যায়। বীরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, যেভাবে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি

পরিচালিত হচ্ছে, তাতে প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হচ্ছে না। দেশবাসীকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা-পদ্ধতিকে অন্যভাবে পরিচালিত করতে হবে। তাই বীরেন্দ্রনাথ দেশে জাতীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।

তিনি কাঁথি শহরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য বীরেন্দ্রনাথ কাঁথির স্বীয় প্রকাণ্ড বাসভবন এবং তৎসন্নিহিত জায়গা ছেড়ে দেন। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয়ের জন্য নূতন বাড়ি তৈরী হলে বিদ্যালয় সেই বাড়িতে উঠে যায় এবং বীরেন্দ্রনাথের বাড়িতে কংগ্রেস অফিসের কাজ চলতে থাকে।

এই সময় কংগ্রেসের জন্য বীরেন্দ্রনাথ যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও অসহনীয় ক্লেশ বরণ করেছিলেন, তা বাংলাদেশের কোনও প্রখ্যাত নেতার তুলনায়ই কম নয়। কংগ্রেসের প্রচার-কার্যে এই সময় তাঁকে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ঘুরে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন তখন বাংলায় পূর্ণোদ্যমে চলছিল। দেশবন্ধু ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা, আর শাসমল ছিলেন তাঁর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। উভয়ে মিলিত হয়ে বাংলাদেশে এই আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ ভারতে পদার্পণ করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি স্থির করেছিলেন যে, ঐদিন সমগ্র ভারতে পূর্ণহরতাল পালন করতে হবে।

বাংলায় যাতে পূর্ণহরতাল পালিত হয়, সেজন্য বীরেন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁর ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় ঐদিন বাংলায় পূর্ণহরতাল পালিত হয়।

পরদিন থেকেই সকলে মনে করতে লাগল যে, এবার দেশবন্ধু, শাসমল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পালা। এ জন্য তাঁরা কেউই ভীত হলেন না। গ্রেপ্তারের জন্য সকলেই প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

৯ই ডিসেম্বরের আগে থেকেই বীরেন্দ্রনাথ জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। ঐদিন রাত্রিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তদীয় পত্নী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে শাসমলের ভবনে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জানান যে, তিনি (চিত্তরঞ্জন) বোধ হয় সেই রাত্রিতেই গ্রেপ্তার হবেন। শাসমলও গ্রেপ্তারের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু সে-কথা তিনি কাকেও জানতে দেন নাই।

১০ই ডিসেম্বর বিকালে বীরেন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে দেশবন্ধুর বাড়িতে গেলেন। এর ঠিক পরেই কলকাতার পুলিস কমিশনার সদলবলে সেখানে হাজির হলেন। দেশবন্ধু ও বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। বাংলার কংগ্রেসের যে সভাপতি ও সম্পাদক এতদিন একসঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করে এসেছেন, তাঁরা আজ একসঙ্গে কারাগারে চললেন।

॥ আট ॥

১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁদের বিচার শেষ হয়। বিচারে তাঁরা উভয়ে ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। প্রেসিডেন্সী জেলে উভয়েই একসঙ্গে কারাজীবন যাপন করেন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তাঁদের কারাবাস-কাল শেষ হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা একসঙ্গে দেশবন্ধুর বাড়িতে ওঠেন।

এই কারাবাসের পর যখন বীরেন্দ্রনাথ কাঁথিতে যান, তখন প্রায় তুই লক্ষ নরনারী এই দেশসেবকের বিপুল অভ্যর্থনায় যোগদান করেন। এতেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কীভাবে কাঁথিবাসীর অন্তর জয় করেছিলেন।

॥ নয় ॥

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর বীরেন্দ্রনাথ আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের কার্য পান নাই। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে পুর্বের মতই কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করতে না

পারলে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যাবে না এবং তাতে দেশবাসী অনেক সুযোগ হারাবে। এই জন্য তিনি গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে কংগ্রেস-দলীয় ব্যক্তিরা প্রবেশ করে ঐ সমস্তের সংস্কারসাধন করতে পারেন, তার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কতিপয় নেতা দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে দেশবন্ধুর পরাজয় ঘটে। পরাজয় ঘটলেও দেশবন্ধু কংগ্রেস পরিত্যাগ না করে স্বতন্ত্রভাবে এক নূতন দল গঠিত করেন। এই দলের নাম হয় 'স্বরাজ্য দল'। চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের নেতা ও সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ এই দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা স্থাপিত হয় এবং বীরেন্দ্রনাথ উক্ত পত্রিকার অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন।

স্বরাজ্যদল-গঠনে দেশপ্রাণ ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ; দেশবন্ধু যদি এইরূপ সহকর্মী না পেতেন, তবে তাঁর পক্ষে এই স্বরাজ্যদল-গঠন সম্ভবপর হত না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নির্বাচনে বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি-তমলুক ও ২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবার—এই দুই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে দেশবন্ধুকে মেদিনীপুরের আসন ছেড়ে দিলেন।

॥ দশ ॥

স্বরাজ্য দলের নির্দেশানুসারে কেবল যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রবেশের ব্যবস্থা হয়েছিল তা নয়, স্বায়ত্তশাসন-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশের ব্যবস্থা হয়েছিল। তদনুসারে ১৯২৩ সালে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড-নির্বাচনে ঐ জেলার কংগ্রেস-কর্মিগণের চেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথ বোর্ডের আসন অধিকার করে তার সভাপতি নির্বাচিত হন।

বীরেন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে স্বীয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মপ্রচেষ্টায় তিন বৎসরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডটিকে একটি আদর্শ জেলা-বোর্ডে পরিণত করেন। তিনি স্বীয় অদ্ভুত কর্মদক্ষতা-প্রভাবে মেদিনীপুরের নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায়কে পর্যন্ত জেলা-বোর্ড এবং তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর কর্তব্য কি, তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার ফলে নিরক্ষর কৃষকেরাও তাদের সুখ-সুবিধার দাবি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তারা বুঝেছে—জেলা-বোর্ড তাদেরই প্রতিষ্ঠান এবং জেলা-বোর্ডের অর্থ তাদেরই হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। জেলা-বোর্ডের কার্য-সুপরিচালনার জন্য, দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবার জন্য এবং সমগ্র জেলার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য বীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং জেলার সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়াতেন। কোথায় দেশবাসীর সুবিধার জন্য পথঘাট প্রস্তুত করতে হবে, কোথায় বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করতে হবে, কোথায়

কূপ ও পুষ্করিণী খনন করে দিলে গ্রামবাসীর জলকষ্ট দূর হবে,—এই সমস্ত বিষয় ছিল বীরেন্দ্রনাথের কর্মসূচীর অন্তর্গত। জেলা-বোর্ডের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের মধ্যে যাতে জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হয়, সেজন্য তিনি ঐ বিদ্যালয়সমূহে জাতীয়তামূলক পাঠ্যপুস্তক তাদের অধীত বিষয় বলে নির্ধারিত করে দিয়ে-ছিলেন। জেলা-বোর্ডের অর্থ যাতে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হয়, সে-বিষয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দেশবাসীর হৃদয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার জন্যে সর্বদা তিনি চেষ্টিত ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের জেলা-বোর্ডের সভাপতি থাকাকালেই বাংলার তদানীন্তন লাট লর্ড লিটনের মেদিনীপুর-পরিদর্শনে গমনের কথা হয়। জেলা বোর্ডের কোনো কোনো সদস্য প্রস্তাব করলেন যে, লাট সাহেবকে অভিনন্দন দেওয়া হোক। কিন্তু এই বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথ সম্মতি দিতে পারলেন না।

সরকার কর্তৃক মনোনীত মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের জনৈক সদস্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাতুড়ী বীরেন্দ্রনাথের উপর একবার অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই সংবাদে মেদিনীপুর জেলায় ৭৮টি সভার অনুষ্ঠান হয় এবং প্রত্যেক সভাতেই বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাজেই, ভাতুড়ী মহাশয় নিরুপায় হয়ে স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একদিন বীরেন্দ্রনাথকে তাঁর বাংলোয় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা

করবার জন্যে পত্র লেখেন। বীরেন্দ্রনাথ সেই পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন, তাঁর যাওয়ার সময় নাই, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বেলা ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এসে জেলা-বোর্ড অফিসে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এইরূপ তেজস্বিতা কেবল মেদিনীপুরের বীরপুত্র বীরেন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

১৯২৫ সালের শেষ ভাগে পুনরায় জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের সভ্য-নির্বাচন হয়। ইতিপূর্বেই জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে বীরেন্দ্রনাথ নানাবিধ দেশহিতকর জনকল্যাণ-মূলক কার্য দ্বারা দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এবারকার লোক্যাল বোর্ড-নির্বাচনেও বীরেন্দ্রনাথের দলই জয়ী হলেন। তাঁর দলের প্রার্থীরা পাঁচটি লোক্যাল বোর্ডের ৭৮টি আসনের মধ্যে ৭৭টি আসন দখল করেন। সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলের এরূপ জয়লাভ ভারত কেন, পৃথিবীর কুত্রাপি পূর্বে হয় নাই। জেলা-বোর্ডের নির্বাচনেও সমস্ত সদস্যের আসনই বীরেন্দ্রনাথের দল কর্তৃক অধিকৃত হয়। শাসমল দ্বিতীয়বার মেদিনীপুর জেলার জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই ব্যাপার থেকেই বুঝতে পারা যায়, বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় কর্ম দ্বারা দেশবাসীর কিরূপ শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু গভর্নমেণ্ট বীরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতায় তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কংগ্রেসসেবীদের উপর বহুদিন থেকেই তাঁরা তীব্র অসন্তোষ পোষণ করছিলেন। কাজেই, এই দ্বিতীয়বার

বীরেন্দ্রনাথের চেয়ারম্যানরূপে নির্বাচন গভর্নমেণ্টের আর সহ্য হল না। গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করতে লাগলেন, বীরেন্দ্রনাথকে সরিয়ে সেই স্থানে অপর ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে। এই কার্যে গভর্নমেণ্টকে বেশি বেগ পেতে হল না। জেলা-বোর্ড গভর্নমেণ্টের স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, গভর্নমেণ্ট বীরেন্দ্রনাথের নির্বাচন নাকচ করে সেই শূন্য আসনে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে নিযুক্ত করলেন। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধদলের সৃষ্টি হয়েছিল। গভর্নমেণ্ট সেই সুযোগেই বীরেন্দ্রনাথের নির্বাচন নাকচ করতে সাহসী হয়েছিলেন।

॥ এগারো ॥

১৯২৩ সালের মধ্যভাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নির্বাচন নিয়ে দেশময় প্রবল সাড়া পড়ে গেল। স্বরাজ্য দল তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচনের জন্য ভোট-সংগ্রহে মেতে উঠল। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-তমলুক যুক্ত কেন্দ্র থেকে এবং ২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্র থেকে সভ্যপদ-প্রার্থী হলেন। ভোটের ফল বার হলে দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ উভয় কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। এর পূর্বে আর কোনও সভ্যই এককালে উভয় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন নাই। বীরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি স্বীয় জেলার আসনটি দেশবন্ধুকে ছেড়ে দিলেন। চিত্তরঞ্জনকে বীরেন্দ্রনাথ কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য-পরিচালনার ভার ছিল বীরেন্দ্রনাথের উপর। তিনি ছিলেন ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের হুইপ। স্বরাজ্য দল-পরিচালনে বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী। চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন, একমাত্র বীরেন্দ্রনাথই তা সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতি বীরেন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও, যে-কার্যে তাঁর মত থাকত না, তাতে তিনি চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন করতেন না। সে-সময়ে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেতার সঙ্গে তর্ক করতে বা তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে একমাত্র বীরেন্দ্রনাথেরই সাহস ছিল।

১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্র বসুকে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু এর পূর্বে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথের মতদ্বৈধ ঘটায় বীরেন্দ্রনাথ মনে করলেন, সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক হলে বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে উক্ত পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্য সুনির্বাহ করা সম্ভবপর হবে না। এইজন্য তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন।

১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'মেয়র' নাম হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রথম মেয়র নিযুক্ত হন। এইবার চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু দলীয় চক্রান্তে পড়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নাই। অবশেষে সুভাষচন্দ্রই উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি বীরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে চলে গেলেন। এই সময় থেকে তিনি বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে একরূপ দূরে সরে রইলেন, কিন্তু স্বীয় জেলা মেদিনীপুরের রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে পারলেন না।

॥ বারো ॥

১৯২৪ সালে বীরেন্দ্রনাথ দারুণ অর্থসঙ্কটে পতিত হন। এই সময় তাঁকে স্বীয় সাংসারিক ব্যয়নির্বাহের জন্য কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করতে হয়। এই সময় বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনে বাংলার মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের জন্য বীরেন্দ্রনাথের নিকট অনুরোধ আসে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে অসম্মত হন। আমরা এক্ষেত্রে দেশপ্রাণের অটল মনোভাবেরই পরিচয় পাই। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে তাঁর অর্থকষ্ট দূরীভূত হত। কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্পের অটল দৃঢ়তার কারণে

তিনি তাঁর একান্ত দরদী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই ছিল বীরেন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯২৪ সালের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। তখন দেশবন্ধু সিমলায় ছিলেন। তাঁরও ধারণা হয় যে, তিনিও গ্রেপ্তার হবেন। তখন বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কে গ্রহণ করবেন, এই নিয়ে তিনি বিশেষ সমস্যায় পড়েন। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি বীরেন্দ্রনাথকেই উপযুক্ত পাত্র স্থির করে তাঁকে এ-বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন। ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত সেই পত্র নিয়ে বীরেন্দ্রনাথের নিকট গমন করেন।

দেশবন্ধু লিখলেন ঃ

প্রিয় শাসমল,

আমরা বিপদের সম্মুখীন হয়েছি এবং তোমাকে আমাদের একান্ত আবশ্যক। আমি আশা করি, তুমি পূর্বকথা ভুলে ক্ষমা করবে এবং বর্তমান অবস্থায় তোমার শক্তি নিয়োগ করবে। আমি যে-কোনও দিন যেতে পারি। রক্ষণশীল দল শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশ তোমার নেতৃত্ব আশা করে। দাশগুপ্ত এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তোমাকে সব কথা খুলে বলবেন।

স্নেহধন্য

সি. আর. দাশ

এই পত্র পাঠ করে বীরেন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হল। তিনি কলকাতায় গিয়ে কংগ্রেসের কার্যভার গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু দাশগুপ্তের একজন সঙ্গী তাঁকে বললেন যে, আপনি যদি বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে কার্য করতে না পারেন, তবে কংগ্রেসের কার্য্যভার-গ্রহণ আপনার পক্ষে একেবারেই সুখের হবে না। এই কথায় বীরেন্দ্রনাথ মত পরিবর্ত্তন করলেন। তিনি দেশবন্ধুর কথামত কংগ্রেসের কার্যভার-গ্রহণের জন্য আর কলকাতায় গমন করলেন না এবং চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না বলে দুঃখিতভাবে ডাঃ দাশগুপ্তকে বিদায় দিলেন।

১৯২৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ এবং বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যপদ এক সঙ্গে পরিত্যাগ করেন। বঙ্গদেশে আইনসভার সদস্যপদ-ত্যাগ এই প্রথম। এই সময়ে তাঁর অর্থসঙ্কট চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পুনরায় মেদিনীপুরে ব্যারিস্টারি করতে আরম্ভ করেন।

বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের মধ্যে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রবেশ করেছে বুঝতে পেরে স্বরাজ্য দল ও আইনসভা পরিত্যাগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেজন্য তিনি দেশবন্ধুর সহযোগিতা পরিত্যাগ করেন নাই; যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন।

১৯২৫ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার যে সম্মেলন-অনুষ্ঠানের কথা হয়, তাতে অধিকাংশ ভোটে

বীরেন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ভূতপূর্ব বিপ্লবিগণ (ex-revolutionaryরা) যদি কংগ্রেস থেকে সরে না দাঁড়ান, তবে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করবেন না বলে জানান। এইরূপ সম্মানজনক পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা বাংলাদেশে এই প্রথম। অবশেষে চিত্তরঞ্জন উক্ত সম্মেলনের সভাপতি হন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু দার্জিলিংয়ে দেহত্যাগ করেন। সে সময় মাহাত্মা গান্ধী খুলনা অঞ্চলে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসেন এবং দেশবন্ধুর মরদেহ-সংকারের পর কে বাংলাদেশের নেতা হবেন, তা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। এই সময় ছুটি নাম মহাত্মার সম্মুখে প্রস্তাবিত হয়ঃ একজন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ, অপর জন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। বীরেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হলে কেউ কেউ মহাত্মাকে বলেন যে, বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন, তিনি আর কংগ্রেসে যোগ দিবেন না। তখন মহাত্মা বললেনঃ "তিনি আসবেন কিনা, সে-ভার আমার উপর—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আনব। এখন আমি শুনতে চাই, তোমরা তাঁকে চাও কিনা।"

তখন দেশপ্রিয় প্রভৃতি বললেনঃ "আপনাকে যেতে হবে না। আমরা কয়েকজন গিয়ে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসব। তাঁর সম্মুখেই সমুদয় বিষয় আলোচিত হবে।"

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের নিকট কেউ না গিয়ে অথবা কোনও চিঠিপত্র না লিখেই মহাত্মাকে জানান হল যে, বীরেন্দ্রনাথের

নিকট যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসতে সম্মত হন নাই। সে-সময়ে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে একটা বড় দায়রার মোকদ্দমায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তার করে মহাত্মাকে সে-কথা জানান।

যা হোক, এই চক্রান্তের ফলে দেশপ্রিয় বড় তিনটি নেতৃত্বের পদ লাভ করেন। প্রথমটি স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব, দ্বিতীয়টি বাংলাদেশের কংগ্রেসের সভাপতিত্ব, তৃতীয়টি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ। বাংলাদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্র চক্রান্তের বিষে বিষাক্ত না হলে হয়ত বীরেন্দ্রনাথই এই তিনটি পদ লাভ করতেন। বীরেন্দ্রনাথের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, নেতৃত্ব বা কোনো পদ লাভ করবার জন্য তিনি কোনপ্রকার অবাঞ্ছনীয় বা কলুষিত পন্থা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্গীয় আইন সভার পদ শূন্য হলে বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মনোনয়ন না নিয়েই স্বাধীনভাবে উক্ত পদ অধিকার করেন। এই সময় আইনসভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন আলোচনা চলছিল। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার নানাস্থান পরিভ্রমণ এবং সভা-সমিতি করে জনসাধারণকে আইনটির মর্ম বুঝিয়ে দেন। এতে প্রজাদের কি ক্ষতি হবে, তাও তিনি তাদের অবগত করান। এইভাবে জনমত সংগ্রহ করে বীরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদের অনুকূলেই ভোট দেন। কিন্তু অধিকাংশ কংগ্রেসী সভ্যই প্রজাদের প্রতিকূলে ভোট দিয়েছিলেন।

॥ তেরো ॥

১৯২৬ সালের ২১শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। জোর গলায় বিপ্লববাদীদের কংগ্রেস থেকে সরে যাবার জন্য বলবার সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই বীরেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে সম্মত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের মূলনীতি হল অহিংসা, কিন্তু 'হিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত কতকগুলি লোক কংগ্রেস দলে প্রবেশ করে কংগ্রেসের পবিত্র উদ্দেশ্যকে পণ্ড করবে'—বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নীতির ঘোর বিরোধী। তাই তিনি কংগ্রেস থেকে বিপ্লবীদের বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি অন্তরে যা বিশ্বাস করতেন, তা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হতেন না। তিনি তাঁর কোনও পক্ষ-সমর্থনকারীকে না পেলেও তজ্জন্য রুষ্ট হয়ে নূতন দল সৃষ্টি করবার বা হীন চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে বিরুদ্ধ দলের অনিষ্ট-সাধন করবার চেষ্টা করতেন না।

তিনি উক্ত সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে বিপ্লববাদি-গণকে অহিংস কংগ্রেসের সংস্রব থেকে দূরে সরে যেতে বলেন। যে-কংগ্রেসের মূলমন্ত্রই অহিংসা এবং যে-কংগ্রেসের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে অহিংসার সেবক বলা হয়, সেই কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সহিংস বিপ্লববাদের নিন্দা করলে

তিনি উক্ত সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে বিপ্লববাদি-গণকে অহিংস কংগ্রেসের সংস্রব থেকে দূরে সরে যেতে বলেন। যে-কংগ্রেসের মূলমন্ত্রই অহিংসা এবং যে-কংগ্রেসের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে অহিংসার সেবক বলা হয়, সেই কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সহিংস বিপ্লববাদের নিন্দা করলে তা কিছুমাত্র দোষের হয় না। দুই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকা এবং এক দলের প্রকাশ্যভাবে এবং অপর দলের গোপনভাবে কাজ করা মোটেই শোভন নয়। এতে কারও কার্যই সুসম্পাদিত হয় না। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধবাদীদের উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করাই সমীচীন।

বীরেন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণের একস্থানে বলেন ঃ

"আমাদের সকল কর্মী এক মনে ও এক প্রাণে প্রতিজ্ঞা করবেন যে, তাঁরা গোপনতার অন্ধকারে কখনও কিছু করতে চেষ্টা পাবেন না। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এখনই violence করা উচিত, তাঁদের কংগ্রেসের সমূহ কার্য-প্রতিষ্ঠান হতে একেবারে সরে দাঁড়াতে হবে। যাঁরা ইতিমধ্যে যে-কারণে হোক মার্কা-মারা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরাও এই সকল কর্মকেন্দ্র থেকে দূরে থাকবেন।"

বীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণের এই অংশটুকু নিয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তাঁকে এই অংশটুকু প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাতে সম্মত হন না। এতে ঘোর

তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। মাত্র ছ-টি ভোটের জোরে বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা-প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির পদ ত্যাগ করে ২৩শে মে তারিখে কলকাতায় চলে এলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

১৯২৬ সালে মেদিনীপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যা হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতে এবং কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, কংসাবতী, থিরাই ও সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ভেসে যায়। এই প্লাবনের ফলে দেশবাসীর দুঃখের অন্ত ছিল না। কত ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গেল, কত শস্যের অপচয় ঘটল, কত গৃহপালিত পশু স্রোতের জলের টানে ভেসে গিয়ে মারা গেল; কত লোক গৃহহীন হয়ে পড়ল এবং কত লোকের জীবনান্ত হল। মেদিনীপুরের বন্যাপ্রপীড়িত জনগণের হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। দেশবাসীর এই দুঃখ-দুর্দশায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের করুণ হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি আর নীরবে বসে থাকতে পারলেন না; আহার্য, বস্ত্র ও অর্থ নিয়ে তিনি বন্যাপীড়িতদের দুঃখমোচনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে আহার-নিদ্রা ভুলে শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলে জ্ঞান না করে দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্যাপৃত রইলেন। দেশপ্রাণ সাহায্য করতে আসাতে দেশে দেশবাসিগণ যেন নবজীন লাভ করল, তাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার আলো ফুটে উঠল। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় দেশবাসীর দুঃখ-দুর্ভোগ অনেকটা প্রশমিত হল।

॥ পনেরো ॥

বন্যার প্রকোপ প্রশমিত হতে না হতেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবল সাড়া পড়ে গেল।

এ-ক্ষেত্রেও বীরেন্দ্রনাথের বিরোধী দল মেদিনীপুর জেলার বাইরে থেকে, বিশেষতঃ কলকাতা থেকে, তাঁকে জব্দ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটী বীরেন্দ্রনাথ, তমলুকের প্রসিদ্ধ উকিল ও দেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাইতি ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধানশিক্ষক শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দান করেন। ওদিকে আবার বীরেন্দ্রনাথের বিরোধীদল-পুষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী শাসমলের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যান দেবেন্দ্রলাল খাঁকে মনোনীত করেন। ওদিকে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুগবেড়িয়ার প্রভূত বিত্তশালী জমিদার শ্রীগঙ্গাধর নন্দকে দাঁড় করানো হয় এবং মহেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয় ব্যারিস্টার শ্রীরেবতীনাথ মাইতিকে। মহেন্দ্রবাবুর সাফল্য সম্বন্ধে কোনও বিশেষ সন্দেহের কারণ ছিল না; কারণ, সমস্ত তমলুক মহকুমার লোক মহেন্দ্রবাবুকে এত বেশি শ্রদ্ধা করত যে, তাঁকে হটানো খুব সহজ ছিল না।

প্রবল বিরোধিতা আরম্ভ হল প্রমথবাবু ও গঙ্গাধর বাবুর

মধ্যে আর বীরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলাল খাঁর মধ্যে। প্রমথবাবু দরিদ্র শিক্ষক আর গঙ্গাধরবাবু বিপুল ভূসম্পত্তিশালী ধনবান জমিদার। বীরেন্দ্রনাথও অর্থশূন্য, তাঁর সম্বল দেশসেবা ও কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্মী। আর, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একজন স্বনাম-ধন্য জমিদার ও জেলা-বোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যান। এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথকেই নিজের কেন্দ্র ও প্রমথবাবুর কেন্দ্রের কার্যপরিচালনার জন্য ছুটোছুটি করতে হয়। যা হোক, অল্প ভোটের পার্থক্যে সেবার বীরেন্দ্রনাথকে পরাজিত হতে হল। কিন্তু এই পরাজয়ে বীরেন্দ্রনাথ হতোদ্যম হলেন না।

১৯৩৩ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার-নির্বাচনে এবং ১৯৩৪ সালে ভারতীয় এসেম্ব্লির সভ্য-নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থিরূপে দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় দেশসেবা ও কর্মপটুতার পরিচয় প্রদান করেন।

১৯২৭ সালে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে হাইকোর্টে যোগদান করেন।

১৯২৭ সালেই নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সভাপতি নির্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হয়ে গ্রাম্যসংস্কার ভাণ্ডারের হিসাব-পরীক্ষার জন্যে এক কমিটী গঠন করেন। এতে অনেকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এবারও তাঁর বিরুদ্ধাচারিগণ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁকে উক্ত পদ থেকে হটাবার চেষ্টা করতে

লাগলেন। ১৯২৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা-প্রস্তাব আলোচিত হয়। মাত্র চার ভোটে বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা-প্রস্তাব পাশ হয়।

এর পর থেকেই বীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকালের জন্য বাংলার কংগ্রেস-রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

॥ ষোলো ॥

১৯২৯ সালে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির লাহোর-অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গভর্নমেণ্ট যদি এই বিষয়ে কর্ণপাত না করেন, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা-অর্জনের উপায়স্বরূপ আইন-অমান্য করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ে কর্ণপাত না করায় ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সমগ্র ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীরা যে অপার কষ্টসহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা ও স্বদেশ-সেবার পরিচয় প্রদান করে, তার তুলনা নাই; এই কাহিনী ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকবে। মেদিনীপুরবাসীর উপর পুলিসের যে অমানুষিক জঘন্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তা কল্পনা করলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মেদিনীপুরবাসীরা অম্লান-বদনে সেই অত্যাচার সহ্য করে তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় অটল থাকে। মেদিনীপুর জেলা এই আন্দোলনে ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করে।

এই আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলাবাসীর উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, বীরেন্দ্রনাথ গভীর মনোবেদনার সঙ্গে তা লক্ষ্য করেন। এই অত্যাচার তদন্ত করবার জন্যে কলকাতায় জনসাধারণের এক সভায় একটি তদন্ত কমিটী গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই তদন্ত কমিটীর একজন সভ্য নির্বাচিত হন।

বীরেন্দ্রনাথ সহ এই কমিটীর সভ্যগণ পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে কাঁথি মহকুমায় উপস্থিত হলে কাঁথির মহকুমার-হাকিমের আদেশে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

এই তদন্ত কমিটী কর্তৃক জনসাধারণের উপর পুলিসী জুলুমের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, বাংলা সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন। এই তদন্ত কমিটীর কার্যপরিচালনার সময় বীরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিশ্রম, কর্মপটুতা ও উৎসাহের পরিচয় দেন।

১৯২৭ সাল থেকেই বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের কার্যক্ষেত্র থেকে দূরে ছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তথাপি সরকার তাঁকে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলে মনে করতেন। যে-কোনও কারণে সেই অগ্নি উদ্গিরিত হলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারে, সরকার সর্বদাই এই আশঙ্কা করতেন। তাই মেদিনীপুরের জেলাম্যাজিস্ট্রেট এই সময় মেদিনীপুর জেলায় বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক বলে মনে করেন এবং ১৯৩০ সালের ১লা নভেম্বর মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বীরেন্দ্রনাথের উপর ১৪৪ ধারা জারী করে তাঁর মেদিনীপুর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন।

বীরেন্দ্রনাথ একটি মোকদ্দমা পরিচালনার ব্যাপারে মেদিনীপুর যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলে তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে

উপস্থিত হলে তাঁকে মোকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু মোকদ্দমা শেষ হলেই তাঁকে মেদিনীপুর-পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়; তাঁর উপর এইরূপ আদেশও দেওয়া হয় যে, তিনি আর দুই মাসের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

এই আদেশে বীরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হল। কারণ, তাঁর বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, বিষয়-সম্পত্তি সবই মেদিনীপুর জেলায় এবং তাঁকে স্বীয় ব্যবসায় সম্পর্কে প্রায়ই মেদিনীপুরে যাতায়াত করতে হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই সমুদয় বিষয় উল্লেখ করে উক্ত আদেশ বাতিল করার জন্যে অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট চিঠি লেখেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রদত্ত আদেশ বাহাল রাখেন এবং মন্তব্য করেন:

"আন্দোলনের গোড়ার দিকে উত্তেজিত অঞ্চলসমূহে বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি রাজনীতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

"বর্তমান সময়ে জেলার আবহাওয়া এমন উত্তেজনাপূর্ণ রয়েছে যে, এই সময়ে জেলার যে-কোনও অংশে বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে। তাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে যে সামান্য বাহিনী আছে, তা দ্বারা অবস্থা আয়ত্তে রাখা ও অনর্থ নিবারণ করা দুঃসাধ্য হবে।

"পূর্বে মেদিনীপুরই তাঁর রাজনৈতিক কার্য ও ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখন কলকাতায় বাস করছেন বটে, কিন্তু মেদিনীপুরেই তাঁর রাজনীতির কেন্দ্র রয়েছে সকলেই

জানেন,—তিনি কেবল তাঁর স্বজাতির উপরে নয়, জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদের উপরও অসীম রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন।

"শ্রীযুক্ত শাসমলের উপস্থিতি সর্বদাই নিরক্ষর জনসধারণের নিকট উত্তেজনা ও উৎসাহের কারণ। প্রেরণা ও নেতৃত্বের জন্য তারা তাঁর মুখাপেক্ষী।

"বর্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত শাসমলের উপস্থিতি জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন করবে।"

বীরেন্দ্রনাথ এই আদেশের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের দায়রা জজের আদালতে আপীল করেন। মেদিনীপুর থেকে বীরেন্দ্রনাথের দরখাস্ত কলকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে বীরেন্দ্রনাথের উপর থেকে ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হয়।

॥ সতেরো ॥

১৯১৭ সালে নূতন প্রদেশ-গঠনের সময় থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা একই গভর্নরের অধীনে শাসিত হতে থাকে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যাবাসীরা উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গণ্য করবার দাবী জানাতে থাকে। এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনাধীন হয়।

উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করতে হলে তাকে তার শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হবে। কিন্তু বর্তমান উড়িষ্যা বলতে যতটুকু অংশ বুঝায়, উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করলে উড়িষ্যার আয় থেকে তার ব্যয় সঙ্কুলান হতে পারে না। কাজেই, ব্যয়নির্বাহের জন্যে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে মেদিনীপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করবার দাবী উড়িষ্যাবাসীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়। এর আগেও ১৯১৩ সালে সরকারের তরফ থেকে মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে নানা কারণে সে সংকল্প পরিত্যাগ হয়।

নূতনভাবে পুনরায় মেদিনীপুরকে বিভক্ত করবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় ভয়ানকভাবে সাড়া পড়ে যায়। মেদিনীপুরবাসীরা তাদের জেলাকে কিছুতেই বিভক্ত হতে দেবে না।

এই সময়ে কাঁথি শহরে "মেদিনীপুর জেলা বিভাগ প্রতিরোধ সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বীরেন্দ্রনাথ সেই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ জেলাবিভাগের প্রতিবাদ ধ্বনি অধিকতর মুখর ও তীব্রতর করে তোলবার জন্যে নানা স্থানে সভা-সমিতি করতে আরম্ভ করেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করে উড়িষ্যাবাসিগণকে বুঝিয়ে দেন যে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হলে তার ফলে উড়িষ্যাবাসীদের কোনই সুবিধা হবে না, সুতরাং মেদিনীপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। এ-বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি একত্র করে পরে তিনি 'Midnapore Partition' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। বীরেন্দ্রনাথ আপনার স্বাভাবিক নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও অকাট্য যুক্তিদ্বারা মেদিনীপুর-বিভাগ প্রতিরোধের জন্য অসামান্য পরিশ্রম করেছিলেন এবং ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর সে পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করবার প্রতিকূলে যে-সমুদয় যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা আমরা পুরুষানুক্রমে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণোন্মাদক জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রতি গৃহেই গীত

হয়ে থাকে। এই সঙ্গীতগুলি বিগত দুই আন্দোলনে কাঁথি-বাসীর পক্ষে প্রধান শক্তিস্বরূপ হইয়াছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভুলে যাক, আমরা এটা সহ্য করতে পারি না। প্রাচ্যের বাংলা সাহিত্যই পৃথিবীর মধ্যে সমাদৃত হয়েছে। আমরা এই সমস্ত সুবিধা পেয়ে গৌরব অনুভব করি এবং কোনও প্রকারেই সেই সমস্ত সুবিধা হারাতে সম্মত নই।

"বাংলার কৃষ্টি এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম, নব্যন্যায়, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মঠ; বাংলার মহাপুরুষ—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ; বাংলার কবি ও লেখক—মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র; বাংলার রাজনৈতিক নেতা—সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, চিত্তরঞ্জন, বাংলার জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—স্যার জগদীশ, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ মেঘনাথ সাহা; বাংলার উন্নত কৃষ্টি ও সভ্যতা, বাংলার উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র—এই সমস্তই গৌরবের বস্তু। এই সমুদয় বস্তুকে আমরা আমাদের নিজস্ব বলে জানি এবং কোনও কারণেই এই সমস্ত বস্তু থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। এই সমস্ত জিনিসের বিনিময়ে আমরা কি পাব, তা আমরা আমাদের ওড়িয়া বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? সম্ভবতঃ নূতন শাসনাধীনে কয়েকটি চাকরি। এই সব অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস।

সামান্য কিছু সুবিধার বিনিময়ে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার বিসর্জন দিতে পারি না।

"সুবর্ণরেখা নদীই বাংলার প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশ করুক, আমরা এই দাবী করি। সুবর্ণরেখার এই পার্শ্বের (অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বের) দুইটি থানা এখনও বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনতিবিলম্বে এই দু'টি থানা অবশ্য অবশ্য মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হোক—এটা আমরা চাই।"

॥ আঠারো ॥

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যে রাজনৈতিক মামলার উদ্ভব হয়, তাতে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতি বহু ভদ্রসন্তান আসামী শ্রেণীভুক্ত হন। এই মামলায় কলকাতার ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য আইনজীবিগণ আসামী-পক্ষ সমর্থন করেন। কিছুদিন মামলা চলবার পর ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু মামলার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। এই সময় সকলেই মনে করেছিলেন, আসামীদের মধ্যে অনেকেরই চরম দণ্ড হবে।

এই সময় আসামী-পক্ষ থেকে বীরেন্দ্রনাথকে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে অনুরোধ করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ তখন বহু সহস্র টাকার ঋণজালে জড়িত, তাঁর আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়, তা সত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও নিজব্যয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। এই মামলা-পরিচালনায় তাঁর সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান, বিশ্লেষণ-শক্তি, বাগ্মিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পেয়ে জনসাধারণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল। এই মামলায় বীরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। যা হোক, এই পরিশ্রমের ফল ফলল, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি আসামীগণ ফাঁসির দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন।

১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম শহরে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। সেই হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে কলকাতায় একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই অনুসন্ধান সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হয়ে, নানা কষ্ট স্বীকার করে অনুসন্ধান-কার্য আরম্ভ করেন। চট্টগ্রাম শহরে যে-সমুদয় পাশবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ প্রভৃতি হীন ও জঘন্য কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সভ্যগণ সেগুলির কিছু কিছু ফটোও তুলে নেন।

সভ্যগণ চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে কলকাতায় টাউন হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা এই সভায় তদন্তের যে রিপোর্ট দাখিল করেন, সরকার-পক্ষ সে-রিপোর্ট প্রকাশ করতে দেন নাই।

১৯৩২ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব আততায়ী শ্রীপ্রভাংশু পালের গুলীতে নিহত হন। আসামী শ্রীপ্রভাংশু পাল পর পর সাতবার গুলী করে পলায়ন করেন। কিন্তু অপর আসামী ১৮ বৎসর বয়স্ক মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য ধরা পড়েন। এর ফলে যে মামলার উদ্ভব হয়, তাতে বীরেন্দ্রনাথ আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। মামলা পরিচালনায় তিনি যে বাগ্মিতা, গভীর আইন-জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা যথার্থই প্রশংসনীয়। এ-কথা ইংরেজ রাজপুরুষগণও স্বীকার করেছেন। এ-জন্য তাঁরা শাসমলকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

এই মামলা-পরিচালনকালে মেদিনীপুরের একজন ইংরেজ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন,—"শাসমলের জেরা কাঠগড়ার হত্যাকারী আসামী অপেক্ষা ভয়ের কারণ।"

এই সমুদয় উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, শাসমল একজন বিচক্ষণ ব্যারিস্টার ছিলেন।

পরদুঃখকাতর উদারপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে বিনা পারিশ্রমিকে বহু মামলা পরিচালনা করতে হত। এই জন্য, তাঁকে কম আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নাই। হুগলীতে এক ট্রাইবুন্যালে তিনজন জজের নিকটে এক বোমার মামলায় বীরেন্দ্রনাথ আসামী-পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলা পাঁচ মাস কাল চলেছিল। বীরেন্দ্রনাথকে প্রত্যহ কলকাতা থেকে হুগলীতে যাতায়াত করতে হত। বীরেন্দ্রনাথ তখন, আসামী-পক্ষ থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু এই পাঁচ মাস কাল তিনি অপর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করেন নাই। কিসে এই মোকদ্দমার আসামীদের মুক্ত করবেন তাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। এতে বীরেন্দ্রনাথকে বহু সহস্র টাকার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বিচারে চারজন আসামীর মধ্যে একজন মুক্তিলাভ করেন, অপর তিনজনের কারাদণ্ডের অদেশ হয়। যে-আসামী মুক্তিলাভ করেন, তাঁকে অব্যবহিত পরেই অস্ত্র আইনে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ এবারও বিনা পারিশ্রমিকে আসামী-পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিচারে আসামী মুক্তিলাভ করেন। নিজে আর্থিক

ক্ষতি স্বীকার করে এবং দারিদ্র্য বরণ করেও বীরেন্দ্রনাথ এইরূপ বিনা পারিশ্রমিকে বহু মোকদ্দমা পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদানে তিনি বাংলাদেশের নিকট থেকে একটু শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতাও লাভ করেন নাই। বাংলাদেশ এমনই স্বার্থান্ধ, আত্মসর্বস্ব ও লোভী রাজনীতিকদের লীলাভূমি!

॥ উনিশ ॥

১৯৩৩ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচন হয়। বীরেন্দ্রনাথ ২৭ নং ওয়ার্ড থেকে প্রবীণ কাউন্সিলার রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বীরেন্দ্রনাথ এবার কংগ্রেসের মনোনয়ন পান নাই, মনোনয়ন পেয়েছিলেন রামতারণবাবু। তিনি বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। এইরূপ একজন প্রবীণ কাউন্সিলারকে পরাজিত করা সহজ কথা নয়। কিন্তু ভোট গণনায় দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ রামতারণবাবুকে প্রায় এক হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন। ভোটগণনার দিন কয়েকজন দুর্বৃত্ত বীরেন্দ্রনাথকে ছুরিকাহস্তে আক্রমণ করেছিল।

কর্পোরেশনের সভ্যরূপে বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন—বাংলার একদল একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর নায়ক হলেন বীরেন্দ্রনাথ।

১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর জেলায় পুনরায় বন্যা হয়। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতা এলবার্ট হলে এক সভা হয়। এই সভায় 'মেদিনীপুর বন্যা সমিতি' নামে যে সমিতি গঠিত হয়, বীরেন্দ্রনাথ তার কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। বন্যা-পীড়িতদের দুর্গতিমোচনের জন্যে এবার

বীরেন্দ্রনাথকে আপ্রাণ পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

এই সময় বাংলার স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্পোরেশনের ক্ষমতা হ্রাস করবার জন্য এক বিল উত্থাপন করেন। বিলের প্রধান কথা ছিল এই যে, রাজনৈতিক কারণে যাঁরা দণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরা কর্পোরেশনের চাকরিতে থাকতে পারবেন না। এই বিষয় নিয়ে কর্পোরেশনে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ৪০ জনের অধিক কাউন্সিলার বিপক্ষে ভোট দিয়ে জয়ী হন। তাঁদের বীরোধিতার কারণেই বিলটি অগ্রাহ্য হয়।

১৯৪৩ সালে মেয়র নির্বাচন সম্পর্কেও এক ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বৎসর গভর্নমেণ্টের মনোনীত দশজন সভ্য কর্পোরেশনের সভায় স্থান পাইবার কথা। ১৯৩৩ সালে সরকারের মনোনীত দশজন সভ্য ১৯৩৩—৩৪ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশনের সভায় স্থানলাভ করেন। ১৯৩৪ সালে মেয়র নির্বাচনের সময় সরকার মনোনীত সভ্যদের সভ্যরূপে থাকবার নির্দিষ্ট কাল অতীত হয়ে গিয়েছিল।

এই বৎসর মেয়র নির্বাচনী সভার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে বীরেন্দ্রনাথ যে নির্ভীকতা ও সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার। তিনি প্রথমত এক রুলিং দিয়ে সরকার-

মনোনীত দশজন সদস্যের মেয়র-নির্বাচনের ব্যাপারে ভোট-দানের ক্ষমতা নাকচ করে দেন। এতে কিছুসংখ্যক কাউন্সিলার ক্রুদ্ধ হয়ে ইউরোপীয় সদস্যদের সঙ্গে সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে যান। মিঃ ফজলুল হক মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু কয়েকজন সভ্যের আবেদনে সরকার ফজলুল হকের মেয়র-রূপে নির্বাচন বাতিল করে দেন। এই ঘটনার পর বীরেন্দ্রনাথ আর এক দিনের জন্যও কর্পোরেশনের সভায় যোগদান করেন নাই।

॥ কুড়ি ॥

বীরেন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অন্তরে গভীর বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতের স্বাধীনতা কেউ রোধ করতে পারবে না। তাঁর এই বিশ্বাস তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে আর কোনও হিন্দু নেতাই বীরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁরই আগ্রহ, উৎসাহ, চেষ্টা ও নির্ভীকতার ফলে ১০ বৎসর পরে ১৯৩৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে একজন মুসলমান মেয়র নির্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ মুসলমানদের যথেষ্ট সুবিধা-দানের পক্ষপাতী ছিলেন। এ-কথা মুসলমানেরাও স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি বলতেন ঃ "মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সমধর্মী নয় বটে, কিন্তু তারা ভারতবাসী অর্থাৎ আমাদেরই দেশের সন্তান এ তো মিথ্যা নয়। কাজেই, তাদের সুবিধা দিলে যদি নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে কিছু অসুবিধা ঘটে এবং সেই সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে জাতি ও সমগ্র দেশের মঙ্গল-সাধনের পক্ষে যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়ে বরং তা অনুকূল হয়, তবে তেমন কাজই করা ভাল।"

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, বাঁটোয়ারা মেনে নিলে

বাঁটোয়ারার মধ্যে যে বিভেদের বীজগুলি নিহিত আছে, তা কালে অঙ্কুরিত হয়ে মহামহীরুহে পরিণত হবে। এতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আশা দূরে সরে যাবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সভা এই বাঁটোয়ারার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মতামতই প্রকাশ করেন নাই। কোনও ব্যাপারে কোনপ্রকার মতামত প্রকাশ না করে নীরব থাকলে সেই নীরবতাকে পক্ষসমর্থনই বলা চলে। সেই জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় দল গঠিত হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ এবং কংগ্রেসের সংস্কার করা।

১৯৩৪ সালের ১২ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্বাচন হয়। এর কিছুদিন আগে পণ্ডিত মালব্য কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রচারকার্যে কলকাতায় আগমন করেন। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিষম মতান্তর দেখে বড়ই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তিনি বীরেন্দ্রনাথকে ডেকে বালাদেশ থেকে কোন কোন ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে লাগলেন। সেই পরামর্শ-সভায় বহু কংগ্রেসী সভ্যও উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই অনেকের নাম প্রস্তাব করলেন। বীরেন্দ্রনাথও নানা লোকের নাম প্রস্তাব করলেন।

অবশেষে উপস্থিত সকলে ধরে বসলেন যে, বীরেন্দ্রনাথকেও এক কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে হবে। বীরেন্দ্রনাথ সভ্য-

পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে কেউ তাঁকে হঠাতে পারবে না, বীরেন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে সে বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তথাপি তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের দলগত বিরোধের জন্য দাঁড়াতে অসম্মত হয়ে বললেন,—"দাঁড়াব কি? যেখানে সত্য কথা বললে কেবল নিন্দাভোগ করতে হয়, আমি সে-রকমের রাজনৈতিক দলে থাকি না। দুবার যার উপর অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করা হয়েছে সে আবার দাঁড়াবে কোন ভরসায়? আমি কংগ্রেসের কাউকেই বিশ্বাস করি না। আমি আমার শক্তি জানি, দাঁড়ালে পরাজিত হব না, তাও জানি, কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে আমি দাঁড়াতে চাই না। আমি স্পষ্টবাদী, সত্য কথা লুকিয়ে রেখে মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত নই। স্বচক্ষে দেখছি, যারা মহাত্মা গান্ধীর পরমভক্ত এবং যারা অন্তরের সঙ্গে তাঁর নীতি মেনে চলে, তিনি তাদের কোণঠাসা করছেন। আর যারা গান্ধী-নীতির তত ভক্ত নয়, কেবল স্বার্থ-সাধনের জন্য সাজে, মহাত্মাজী তাদেরই বিশেষভাবে সমর্থন করেন। এই সমস্ত বিবেচনা করে কংগ্রেস-রাজনীতিতে আমার আর থাকবার ইচ্ছা নাই!"

বীরেন্দ্রনাথের কথায় মালব্যজী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমি সবই বুঝি এবং আমিও এর ভুক্তভোগী। কিন্তু বাংলার কথা একবার ভেবে দেখ, বাংলা একেবারে ডুবতে বসেছে। আজ বাংলার স্থান একেবারে সঙ্কীর্ণ। সকলেই বাংলাকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করছে। কংগ্রেস থেকে

বাংলার স্থান একেবারে উঠে যেতে বসেছে। এমতাবস্থায় তোমরা, যারা দেশের নেতা, যদি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াও তবে বাংলা কোথায় নেবে যাবে, তা একবার ভেবে দেখ। আমার বিবেচনায় তোমাদের মতো সকল বাঙ্গালীরই মনপ্রাণ সমর্পণ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা দরকার।"

মালব্যজীর উদ্দীপনাপূর্ণ কথা শুনতে শুনতে বীরেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং বললেন, "আমি দাঁড়াতে রাজী

বীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সভ্যপদ-প্রার্থিরূপে দাঁড়াতে সম্মত হলেন। তখন তাঁর আইন-ব্যবসায় খুব জোরে চলছিল, তথাপি তাঁর অর্থাভাব দূরীভূত হয় নাই; তিনি জানতেন, ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হলে তাঁকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হবে এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, তথাপি কেবল দেশের স্বার্থের জন্যই তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে যেতে সম্মত হলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বর্ধমান অ-মুসলমান কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস জাতীয় দল কর্তৃক মনোনীত হয়ে সভ্যপদপ্রার্থী হলেন এবং মেদিনীপুরের উকিল শ্রীমন্মথনাথ দাস কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়নে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মন্মমথবাবুর বিরুদ্ধাচরণে বীরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ, মেদিনীপুরকে বীরেন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং মেদিনীপুরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে সর্বপ্রকার কষ্ট বরণ

করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই জন্য মেদিনীপুরের প্রতি তাঁর দাবী সকলের চেয়ে বেশী ছিল। এই বিশ্বাস ও দাবী একটু ক্ষুণ্ণ হলেই তাঁর অভিমান হত। এই সময় কতকগুলি স্বার্থপর হীনচেতা লোক তাঁর বিরুদ্ধে অতি হীনভাবে জঘন্য কুৎসা প্রচার করতে থাকে। এতে তিনি হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছিলেন, তা মৃত্যুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নাই এবং এই আঘাতই যে তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তাতে কোনোই সন্দেহ নাই।

বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবে জানিয়ে বলেছিলেন: "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্দেশের মর্ম এই যে, 'তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে না।' এতে বিবেকের নির্দেশ এবং ভগবানের প্রতিকূলতা করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী নিজেই প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীকে সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এবং কখনও ঐ অন্যায়-অবিচার না মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এখন তাঁরই ব্যক্তিত্বের শক্তিতে পুষ্ট কংগ্রেস বিবেকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে উদ্যত। বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব সম্পূর্ণ অবৈধ ও অযৌক্তিক। দমন-নীতির জন্য আমরা সরকারকে দোষ দিই। কংগ্রেসই যদি এখন দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে স্বাধীন জনমতকে চাপা দেন, তা হলে কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে খুব সামান্য প্রভেদই বিদ্যমান থাকবে। পৃথিবীর অপর কোথাও পৃথক নির্বাচনপ্রথা নাই। কেবলমাত্র ভারতের

উপরেই এই অন্যায় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী-প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থাই একমাত্র পন্থা।”

১৯শে নভেম্বর ভোট-গণনার ফল ঘোষণা করা হল। দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মন্মথবাবুকে প্রায় আড়াই হাজার ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীঅমরনাথ দত্তকে ততোধিক ভোটে পরাজিত করে, নির্বাচিত হয়েছেন। বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বাংলার পক্ষ থেকে তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করবেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ আর তাঁর সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করতে পারলেন না। অকালে কালের আহ্বান এসে তাঁকে কর্মজগৎ থেকে অপসারিত করল। এমন কি, নির্বাচন দ্বন্দ্বের বিজয়-সংবাদ যখন পৌঁছল, তখন তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন।

সন্ন্যাস রোগের প্রথম আক্রমণেই তিনি চেতনাহীন হয়ে পড়লেন। পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর নির্বাচনের ফল তাঁর অনুগত কর্মী প্রমথনাথের কাছ থেকে জানতে পেরে আনন্দিত ও সুখী হয়েছিলেন।

॥ একুশ ॥

১৯শে নভেম্বর বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর থেকে কলকাতা-প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনের মধ্যেই সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। যখন তিনি হাওড়া স্টেশনে এসে উপনীত হন, তখন তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বীরেন্দ্রনাথের বিজয়-সংবাদে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ভক্তবৃন্দ, বন্ধুবর্গ ও সহকর্মিগণ ফুলের মালা নিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্যে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গাড়ির মধ্যে বীরেন্দ্রনাথের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই অবস্থাতে বিজয়-সম্বর্ধনার জন্য তাঁর বদনমণ্ডল প্রফুল্ল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হাওড়া স্টেশন থেকে বীরেন্দ্রনাথকে তাঁর বাড়িতে আনয়ন করা হয়। কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত হলেন। যাঁরা তাঁর রোগ-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর আর অন্য কথা ছিল না। তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, কি করে তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিকূলতা করবেন, কি করে তিনি দেশের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবেন। তিনি বললেন, "আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি প্রধানমন্ত্রী কৃত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে প্রবর্তিত হতে দেব না।"

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের সে-আকাঙ্ক্ষা ভগবান পূর্ণ হতে দিলেন

না। বাংলার পক্ষে ইহা যে পরম দুর্ভাগ্য তাতে সন্দেহ নাই।

সেই রাত্রিতেই বীরেন্দ্রনাথের চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল—আর তা ফিরল না। ছয়দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটাবার পর ২৪শে নভেম্বর মেদিনীপুরের এই মুকুটহীন রাজা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ অমরধামে প্রস্থান করলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অকালে খসে পড়ল।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে বীরেন্দ্রনাথ যে-উইল করে গিয়েছিলেন, তাতে এই চিরউন্নতশীর্ষ মহাপুরুষ লিখে রেখে গিয়েছেন :

"জীবিতাবস্থায় আমি যে-শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনত করা না হয়। আমাকে যেন মৃত্যুর পর দণ্ডায়মান অবস্থায় সৎকার করা হয়।"

তাঁর বাসনানুযায়ী "চির-উন্নত-শির" বীরকে কেওড়াতলা শ্মশানে উন্নতশির রাখিয়াই সৎকার করা হয়।

স্বর্গীয়া জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "১৯২০ সালে আমরা একসঙ্গে কার্য করিয়াছি। পরে আমি ও অনেকে তাঁহাকে বাংলার উদীয়মান নেতারূপে বরণ করিয়াছিলাম। 'মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা' যে বাংলা দেশেরও রাজা হইয়া উঠিবেন, ইহাই আমরা আশা করিতেছিলাম। শাসমলের নাম তালার চাবির মতোই মেদিনীপুরের কৃষককুলের হৃদয়দ্বার খুলিয়া

দিয়াছিল। এমন কি, যখন আইন ও শৃঙ্খলার নামে নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায়ের শোণিতধারা দ্বিগুণ চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন শাসমলের নামে যাদুমন্ত্রে আমি যে শক্তি পাইয়াছিলাম, তাহাতে সেই নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায় এবং জনতাকে সহজে আয়ত্ত রাখিতে পারিয়াছিলাম। হে দেশমাতৃকার যজ্ঞের সহকর্মী, নির্বাচন-দ্বন্দ্ব-অন্তে আমরা পুষ্পমাল্য লইয়া গান গাহিতে গাহিতে হাসিভরা মুখে তোমাকে রাজোচিতভাবে অভিনন্দিত করিব,—আমরা এই আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। পুষ্পমাল্য লইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা তোমার শোকযাত্রা করিয়াছি এবং আকাশের দিকে তোমার শির উন্নত রাখিয়া তোমার নশ্বর দেহ চিতার উপর স্থাপিত করিয়াছি। শির উন্নত করিয়া রাখা তোমার পক্ষেই উপযুক্ত। কারণ, তুমি পরম-পুরুষ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট অবনতশির হও নাই।”

বীরেন্দ্রনাথ জাতির যথার্থ সেবক ছিলেন। দেশের প্রকৃত সেবা করেই তিনি নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই নেতৃত্ব রক্ষা করবার জন্য তিনি কোনোপ্রকার ছলনাময় পন্থা বা বিবেক-বিরুদ্ধ নীতি অবলম্বন করেন নাই। যা তিনি মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, আজীবন তাই অনুসরণ করে গিয়েছেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এবং সর্বোপরি আইন-অমান্য আন্দোলনে যে-মেদিনীপুর জেলা সমগ্র ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন

সেই মেদিনীপুর জেলার নেতা। কাজেই, তাঁর নেতৃত্ব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কোনও ভণ্ডামি ছিল না। সময়-বিশেষে নেতা সাজা ও সময়-বিশেষে সরে পড়া—এই নীতিকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। দেশবাসীর প্রকৃত দুঃখকষ্ট দূর করে দেশসেবার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করেছিলেন এবং এইজন্য তাঁকে কম আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয় নাই; তথাপি তিনি কর্তব্য-পথ থেকে বিচ্যুত হন নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বলতেন, জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে না পারলে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয় না। তাই দেশের পল্লীবাসী নিরক্ষর কৃষককুলের মনে দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা জাগানোই ছিল তাঁর প্রধান কার্য। মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন-বোর্ড-স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মেদিপুর জেলা-বোর্ডের কার্য, গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ, গ্রামবাসীদের সঙ্গে আপনজনের মতো মেলামেশা করা—এই সমস্ত কথা ভেবে দেখলে জনসাধারণের দুঃখে বীরেন্দ্রনাথ যে কিরূপ কাতর ছিলেন, তা বুঝতে পারা যায়। দেশের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, এই যেন ছিল দেশপ্রাণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য তিনি সর্বপ্রকার সুখশান্তি বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই দেশহিতের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। মেদিনীপুরবাসীরা তাঁকে কেবল তাঁদের নেতা বলে

জানত না, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে নিজেদের আপনার জন বলে মনে করত। যারা কখনও তাঁকে দেখে নাই, তারাও বিপদের সময় বলত: "ভয় কি, আমাদের শাসমল আছেন!" কোনও দেশনেতাই দেশের আপামর জনসাধারণের এইপ্রকার আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন নাই।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন শিশুর মতো সরল ও অনাড়ম্বর। তাঁর আচার-আচরণ বা পোশাকের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। ব্যারিস্টারি করবার সময়ও তিনি খদ্দরের কোটপ্যান্ট ব্যবহার করতেন। আহারাদি বিষয়েও তাঁর কোনও আড়ম্বর ছিল না।

বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনও নিজের জননী এবং দেশ-জননীকে বিস্মৃত হন নাই।